বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস - ২০২৫

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা

মো. খালিদ হাসান

প্রতি বছর ৩ মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস। এটি সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে গত দুই দশকে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, দেশে বর্তমানে অনুমোদিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১ হাজার ৩৬৯টি, যার মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ৫৬১টি। এছাড়া সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদি মিলিয়ে সর্বমোট নিবন্ধিত পত্রিকা সংখ্যা ৩ হাজার ৩১০টি। টেলিভিশন খাতে অনুমোদিত বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা ৪৫টি এর মধ্যে ৩০টির বেশি সম্প্রচারে রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), বিটিভি নিউজ এবং সংসদ টেলিভিশন। তবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উত্থানে অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিস্তার ঘটেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-নির্ভর সাংবাদিকতা এবং ইউটিউব চ্যানেল ভিত্তিক সংবাদ উপস্থাপনাও সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

২০২৫ সালের বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘প্রেস ফর দ্য প্ল্যানেট: জার্নালিজম ইন দ্য ফেইস অব দ্য এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইসিস’ মূলত পরিবেশ রক্ষায় সাংবাদিকতার অপরিহার্য ভূমিকাকে তুলে ধরে। বৈশ্বিক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, পানি দূষণ, শিল্পবর্জ্যসহ পরিবেশগত নানা সংকট যখন মানব সভ্যতার অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলছে, তখন সাংবাদিকতাকে কেবল তথ্য প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নয়—বরং সচেতনতা সৃষ্টির অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই প্রতিপাদ্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় সাংবাদিকদের দায়িত্ব শুধু রিপোর্টিংয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি নৈতিক দায়িত্বও।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, পানির সংকট ও বায়ুদূষণ—এই সব পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ দেশের কোটি মানুষের জীবিকা ও জীবনধারাকে প্রভাবিত করছে। অথচ এসব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে গণমাধ্যমে বিশ্লেষণাত্মক ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এখনও সীমিত। প্রতিপাদ্যটি এই বাস্তবতায় সাংবাদিকতাকে পরিবেশ বিষয়ে অধিক মনোযোগী ও দায়বদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। বাংলাদেশে অনেক সময় অবৈধ ইটভাটা, বন উজাড়, নদী দখল, রাসায়নিক বর্জ্য ফেলা, শিল্প দূষণ ইত্যাদি পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের পেছনে প্রভাবশালী চক্র বা দুর্নীতির সংশ্লিষ্টতা থাকে। এসব ঘটনা অনুসন্ধানে সাহসী সাংবাদিকতার প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশ সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে ব্যক্তির বাক-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি। এই সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী সরকার গণমাধ্যমের বিকাশ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বিশেষভাবে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস করে সরকার নাগরিক ও সাংবাদিকদের সরকারি-বেসরকারি খাত থেকে তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে সরকার অনলাইন সংবাদপোর্টাল নিবন্ধনের মাধ্যমে একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য মিডিয়া কাঠামো গড়ে তুলছে। সাইবার সুরক্ষার অধ্যাদেশ - ২০২৫ এর খসড়ায় সরকার সাইবার অপরাধ, ডিজিটাল বিভ্রান্তি ও গুজব দমনের উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও সংবেদনশীলতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় থাকে। সরকারের মতে, এই আইন জনস্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জরুরি এবং এর মাধ্যমে গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা ও পেশাদারিত্ব

নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতেও সরকার এই আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি নিরাপদ, স্বচ্ছ ও স্বাধীন গণমাধ্যম পরিবেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দেশের গণমাধ্যমের নীতিগত উন্নয়ন, নৈতিক সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্রের মানোন্নয়নে কাজ করছে। ১৯৭৪ সালে গঠিত এই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি সাংবাদিকদের আচরণবিধি প্রণয়ন, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া তথ্য কমিশন নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করতে এবং সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস ও ইউনেস্কো বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা রাখে। ইউনেস্কো প্রতি বছর বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ ও বিশ্বজুড়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব সংস্থা প্রেস ফ্রিডম সূচক প্রকাশ, হুমকির মুখে থাকা সাংবাদিকদের সহায়তা, গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে স্বাধীন সাংবাদিকতা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হলুদ সাংবাদিকতা বা ইয়েলো জার্নালিজম এমন এক ধরণের সংবাদচর্চা, যেখানে সত্য যাচাই ছাড়াই চমকপ্রদ, উত্তেজনামূলক বা মনগড়া তথ্য প্রচার করা হয় শুধুমাত্র পাঠক টানার উদ্দেশ্যে। গুজব, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, ব্যক্তিগত আক্রমণ, এবং ক্লিক-বেইট শিরোনামের মাধ্যমে এ ধরনের সাংবাদিকতা তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ফলে জনগণের মধ্যে গণমাধ্যমের প্রতি আস্থা কমে যায়, যা দীর্ঘমেয়াদে স্বাধীন সাংবাদিকতার ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, কিছু অনলাইন পোর্টাল কিংবা ইউটিউব ভিত্তিক সংবাদ চ্যানেল অনেক সময় দায়িত্বহীনভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে দেয়, যা সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এর ফলে পুরো সাংবাদিক সমাজ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

পশ্চিমা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী, কংগ্রেস কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না যা বাক্-স্বাধীনতা বা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে বাধা দেয়। এতে সাংবাদিকরা রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের নানা বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ও সমালোচনা করতে পারেন—সরকারের পক্ষপাতমূলক হস্তক্ষেপ ছাড়াই। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতেও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ইইউ মিডিয়া ফ্রিডম আইনের মতো আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হচ্ছে। উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা, পাবলিক ব্রডকাস্টিং সিস্টেম, এবং সাংবাদিক ইউনিয়ন ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন: বিবিসি ট্রাস্ট (যুক্তরাজ্যে) বা পিবিএস ও এনপিআর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত হলেও কার্যত স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করে। পাশাপাশি রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ নানা সিভিল সোসাইটি সংগঠন সরকারের সিদ্ধান্ত বা নীতিমালার সংবাদমাধ্যম-বিরোধী দিকগুলো নিয়ে সোচ্চার থাকে। ফলে, সাংবাদিকদের স্বাধীনতা শুধু আইনি নয়—সমাজের চর্চার মধ্যেও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অনেক সময় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাধার মুখোমুখি হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, দুর্বল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার অভাব এবং নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার অতিসক্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভূমিকা রাখে। এসব দেশে সাংবাদিকদের ওপর নজরদারি, মামলা-মোকদ্দমা, গ্রেপ্তার বা নিখোঁজ হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে, যা সাংবাদিকতা চর্চাকে ভীতিকর ও সীমিত করে তোলে। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা অর্জনে ব্যর্থ অনেক গণমাধ্যম মালিকানাভিত্তিক স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ফলে সাংবাদিকরা অনেক সময় সম্পাদকীয় স্বাধীনতা হারান। পাশাপাশি অনেক উন্নয়নশীল দেশে মিডিয়া হাউজগুলোর বিজ্ঞাপন নির্ভরতা সরকারের কাছে একধরনের চাপ তৈরি করে, যার ফলে সরকারবিরোধী বা সমালোচনামূলক রিপোর্ট প্রকাশে অনীহা দেখা যায়। আবার গণমানসিকতা ও রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রভাবে অনেক সময় সংবাদমাধ্যম পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে, যার ফলে জনগণের আস্থা হারায় এবং সত্যিকারের মুক্ত সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে একদিকে যেমন সম্প্রসারিত করেছে, অন্যদিকে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে। ফেসবুক, টুইটার (বর্তমান এক্স), ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম সাংবাদিকদের জন্য তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার, ভিন্নমত প্রকাশের এবং বিকল্প সংবাদ পরিবেশনের একটি স্বাধীন ও দ্রুতগতির মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মূলধারার গণমাধ্যম যখন কোনো

কারণে নিরব থাকে বা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনেক সময় সত্য ঘটনাকে সামনে আনতে ভূমিকা রাখে—যা গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক। তবে এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে মিথ্যা তথ্য, গুজব এবং বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা সাংবাদিকতার গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেক সময় সাংবাদিকরা সামাজিক মাধ্যমে হয়রানি, চরিত্রহনন, এমনকি মৃত্যুর হুমকির শিকার হন। সরকার ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোও এই প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে নাগরিক সাংবাদিকতা ও স্বাধীন মত প্রকাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের সুযোগ তৈরি হয়। ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আজ এক জোড়া ধারালো তরবারির মতো—যা একদিকে প্রেস ফ্রিডমের প্রসার ঘটায়, আবার অন্যদিকে তা সংকুচিত করার সুযোগও তৈরি করে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে তখনই অর্থবহ হয় যখন গণমাধ্যম দায়িত্বশীলভাবে নির্ভরযোগ্য, তথ্যভিত্তিক এবং যাচাইকৃত সংবাদ পরিবেশন করে। এই পর্যায়ে ফ্যাক্ট চেকিং বা তথ্য যাচাই একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সংবাদ প্রকাশের আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই সাংবাদিকতার নৈতিকতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্বাধীন সাংবাদিকরা যখন যাচাইকৃত তথ্য নিয়ে কাজ করেন, তখন তা রাষ্ট্র, সমাজ এবং জনসাধারণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করে—যা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি। অন্যদিকে, ফ্যাক্ট চেকিং প্রক্রিয়াকে যদি সীমিত করা হয় বা নিরপেক্ষভাবে চালাতে না দেওয়া হয় তাহলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কার্যত বাধাগ্রস্ত হয়। তাই ফ্যাক্ট চেকিং শুধু সংবাদ শুদ্ধির মাধ্যম নয়—এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রতিরক্ষা ব্যুহ যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে কার্যকর রাখে এবং অপপ্রচার, গুজব ও প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার